সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : লক্ষ্য ও প্রাপ্তি

Fb group: Argumentative & Focus Writing

‘সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা’র মেয়াদ শেষ । পাঁচ বছরব্যাপী (২০১৬-২০২০) বাস্তবায়নযোগ্য সরকারের এই উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিপাদ্য, ‘প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, নাগরিকের ক্ষমতায়ন’। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) কর্তৃক ২০ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অনুমোদিত এ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, ‘কৃষি থেকে শিল্প অর্থনীতিতে উত্তরণ এবং মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরের পথ প্রশস্তকরণ’।

পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে দেশ রূপান্তরের পথ কতটা প্রশস্ত হল সেটা আলোচনার দাবি রাখে। সম্মানিত অর্থনীতিবিদরা নিশ্চয় আলোচনা করবেন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফলতা-ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করবেন। নানা তত্ব-তথ্য দিয়ে দেখাবেন কেন পরিকল্পনার ‘মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো’ অথবা ‘দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন কৌশল’ কার্যকর হয়েছে, অথবা হয়নি। কিন্তু আমরা যারা অর্থনীতিবিদ তারা মোটা দাগে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি প্রকৃতি বুঝতে চাই। সরল বাক্যে বোঝার চেষ্টা করি কতটা শক্ত হয়েছে আমাদের উন্নয়নের ভিত।

বাংলাদেশে পরিকল্পিত অর্থনীতির ভিত নিহিত আছে সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে। এখানে বিধৃত আছে, ‘রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন...।’

জাতির পিতা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন পরিকল্পিত উন্নয়নের ওপর। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র ২১ দিনের মাথায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরিকল্পনা কমিশন। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে। পরিকল্পনা বিভাগের ভিশন ‘টেকসই সময়াবদ্ধ ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।’ এ বিভাগ থেকে প্রণীত ‘সময়াবদ্ধ’ উন্নয়ন পরিকল্পনার মাঝে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল ‘পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা’।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ‘প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা’ গৃহীত হয়েছে নভেম্বর ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৩-১৯৭৮ মেয়াদি এ পরিকল্পনা দলিলে নিহিত আছে সদ্য স্বাধীন জাতি গঠনের সব মানসিক শক্তি। আছে আবেগ। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মুখবন্ধে জাতির পিতা বলেছেন, 'শত্রুমুক্ত হবার পর দেশে কোনো পরিকল্পনা কাঠামো ছিল না, অথবা অর্থনীতির কোনো ক্ষেত্রেই ছিল না কোনো সমন্বিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্ত। এতদসত্ত্বেও, যত দ্রুত সম্ভব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কারণ, সরকার যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়ক একটি সঠিক লক্ষ্য ও কাঠামোর মধ্যে এর অগ্রাধিকারক্রম নির্ধারণের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে'। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনই শুধু নয়, প্রথম পরিকল্পনায় সরকারের অগ্রাধিকার ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতি- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের আগামী দিনের গতিপথ নির্দেশনা দেয়া।

এরপর বাংলাদেশ সাক্ষী হয় ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের। জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে পরিবর্তন ঘটানো হয় রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্রের। রাষ্ট্রের বিচ্যুতি ঘটে উন্নয়নের পথ থেকে। মাঝে মাঝে অনুপস্থিত থাকে উন্নয়ন পরিকল্পনার।

১৯৭৮-১৯৭৯-এ দু'বছর স্বল্পমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা ছিল না। পরবর্তীকালে ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ এই পনেরো বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। ১৯৯৭ থেকে ২০০২ এই পাঁচ বছর উন্নয়নের পথে দেশ এগিয়ে গেছে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। তারপর আবার দীর্ঘ বিরতি। ২০০৩ থেকে ২০১০ সময়ে দেশে কোনো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল না। ছিল উন্নয়ন সহযোগীদের চাপিয়ে দেয়া 'দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র'।

বর্তমান বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ধারার ভিত্তি রচিত হয়েছে 'ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। ২২২ পৃষ্ঠার মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ২০১১ থেকে ২০১৫ সময়ে বাস্তবায়িত এ পরিকল্পনার নানা পূর্ণতা-অপূর্ণতার দিক। এ সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম, প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি, মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহারসহ বেশ কিছু সূচকের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে।

ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ, রফতানি, রাজস্ব আদায়ের হার বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশ পিছিয়ে ছিল সরকার। তথাপি জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল রেকর্ড ৬.৩ শতাংশ হারে। উচ্চাভিলাষী অনেক প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা অপূর্ণ থাকলেও প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ-এর ভাষ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাংলাদেশের 'উন্নয়নের জীবন্ত দলিল'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পরিকল্পনা বাংলাদেশের উন্নয়ন-অভিযাত্রায় গতিশীলতা সঞ্চার করেছে উল্লেখ করে বলেছেন, 'সমাজ ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত হয় অসামান্য সাফল্য, যা নিয়ে বাংলাদেশ গর্ববোধ করে'।

একইসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘আমরা যাতে আমাদের উন্নয়ন অভীপ্সা পূরণসহ একটি ন্যায্য ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ে তুলতে পারি’, তারই দক্ষ নেতৃত্বে ২০১৬-২০২০ সময় পরিধিতে দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে এ পরিকল্পনা। পাঁচ বছর পর এসে আমরা জানার চেষ্টা করছি কতটুকু পূরণ হয়েছে ‘আমাদের উন্নয়ন অভীপ্সা’।

মোটা দাগে দেশের উন্নয়ন বোঝার প্রধান সূচক হল ‘মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)’। আইএমএফের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী ‘জিডিপি হল কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি দেশের মধ্যে উৎপাদিত সকল চূড়ান্ত পণ্য এবং পরিষেবার বাজারমূল্য’। ৩০ জুন ২০১১ সমাপ্ত অর্থবছরে বাংলাদেশের উৎপাদিত সব চূড়ান্ত পণ্য এবং পরিষেবার বাজারমূল্য অর্থাৎ জিডিপি ছিল ৯,১৫,৮২৯ কোটি টাকা।

‘সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা’র সময়াবর্তে বাংলাদেশের জিডিপি বেড়েছে উল্লেখ্যযোগ্য হারে। ‘বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০’ মতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ১৫,১৫,৮০২ কোটি টাকার জিডিপি বেড়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে হয়েছে ২৭,৯৬,৩৭৮ কোটি টাকা। প্রায় দ্বিগুণ। ২০১৬-২০২০-এ পাঁচ বছরে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হয়েছিল ৭.২ শতাংশ হারে। করোনা প্রাদুর্ভাবের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে জিডিপি অর্জিত হচ্ছিল লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হারে! বিবিএসের তথ্যমতে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৮.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যের বিপরীতে অর্জিত হার ছিল ৮.১৫ শতাংশ।

এ করোনাকালেও (২০১৯-২০২০ অর্থবছরে) প্রাক্কলিত জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে ৫.২৪ শতাংশ হারে, যা ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের পর সর্বনিম্ন, কিন্তু পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের চেয়ে ঢের বেশি। এসব দেখেই হয়তো বিশ্বব্যাংক বলতে বাধ্য হচ্ছে, ‘টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে দারিদ্র্য হ্রাসে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে’। আইএমএফ তারিফ করে বলেছে, বাংলাদেশ চিত্তাকর্ষক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং সামাজিক বিকাশ অর্জন অব্যাহত রেখেছে’।

‘মাথাপিছু আয়’ উন্নয়ন আন্দাজ করার অন্যতম নিয়ামক। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাৎসরিক মাথাপিছু আয় ৯৬,০০৪ টাকা থেকে বেড়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে হয়েছে ১,৬৬,৮৮৮ টাকা। এ সময়ে মাথাপিছু জিডিপি বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। কিন্তু মাথাপিছু জিডিপি দিয়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির অবস্থা আন্দাজ করতে পারলেও ব্যক্তির সক্ষমতা অথবা আয় বৈষম্য বোঝা যায় না।

আয় বৈষম্যের ক্রমাগত বৃদ্ধির রাশ টেনে ধরা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। হয়েছেও তাই। সমাজে আয় বৈষম্য নিরূপণের জন্য ব্যবহৃত হয় 'গিনি সূচক'। 'শূন্য থেকে এক' এই স্কেলের প্রবর্তক ইতালীয় পরিসংখ্যানবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানী করারাদো গিনি। বৈষম্য যত বেশি 'গিনি সূচকের' মান তত বেশি। ২০০০ সালে গিনি সূচক ০.৪৫১ থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে হয়েছে ০.৪৮২। ১৯৮০-এর দশকের পর থেকে গত অর্থবছর পর্যন্ত আয় বৈষম্য কমেনি। বরং বৃদ্ধি পেয়েছে অব্যাহতভাবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্বিষ্ট ছিল ২০২০ অর্থবছর নাগাদ দারিদ্র্য হার ১৮.৬ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্য হার ৮.৯ শতাংশে হ্রাস করা। কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে না হলে এ সময় আবর্তে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। ২০১৬ সালের দারিদ্র্যের হার ২৪.৩ শতাংশ থেকে নেমে ২০১৯ সালে হয়েছে ২০.৫ শতাংশ, এ সময়ের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার ১২.৯ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১০.৫ শতাংশ। তথাপি, সতেরো কোটি লোকের দেশে এক-পঞ্চমাংশের বাস এখনও দারিদ্র্য রেখার নিচে, প্রায় এক কোটি আশি লাখ বাস করেন চরম দারিদ্রসীমার নিচে।

দ্রুত সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে অর্থনীতির ধারাবাহিক কাঠামোগত পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক রূপান্তর অপরিহার্য। সে লক্ষ্যে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর ওপর জোর দেয়া হয়েছিল সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ ও নগর অর্থনীতির ব্যবধান হ্রাস করার ওপর জোর দিয়েছিল সরকার।

বিগত পাঁচ বছরে শিল্প, সেবা ও কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১১.৫, ৬.৫ এবং ৩.৩ শতাংশ হারে। দ্রুত শিল্প উন্নয়নের ফলে জিডিপিতেও শিল্প খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, হ্রাস পেয়েছে কৃষি খাতের অবদান। ২০১৫ সালে সমাপ্ত অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৫.৩৬, ২৯.১৯ এবং ৫৫.৪৫ শতাংশ। ২০১৯ সালে এসে এ হার ছিল যথাক্রমে ১৩.৬১, ৩৪.৫৭ এবং ৫১.৮২ শতাংশ।

মধ্য আয়ের দেশে যাত্রার পথে বিগত পাঁচ বছরে সরকার অ-পোশাক রফতানি খাতের কাঠামোর উন্নতিকরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষকদের ভালো প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা, পশু ও মৎস্য ক্ষেত্রে মনোযোগ সৃষ্টি, আইসিটি খাতে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে রফতানি বৃদ্ধি, জনপ্রতি বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার বৃদ্ধিকরণ বিদ্যুৎ উন্নয়ন, জ্বালানি ও যোগাযোগ খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সফলতা দেখিয়েছে।

অপরদিকে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা, অন-লাইন ভ্যাট আইন প্রয়োগের ট্যাক্স/জিডিপি অনুপাতের উন্নতিকরণ, কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ গঠন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূরণ হয়নি সরকারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। অঙ্কের হিসাবে ২০১৫ সালের ৬.৫ শতাংশ মূল্যস্ফীতি ২০২০ সালে ৫.৫ শতাংশে মেনে এসেছে।

কিন্তু নিম্ন আয়ের জনগণের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি গ্রহণ, মানসম্মত জীবনধারণ এখনও বিরাট চ্যালেঞ্জ। পাঁচ বছরে দেশে-বিদেশে নতুন ১ কোটি ২৯ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রথম চার বছরে সৃজন করা গেছে মাত্র ৭৪ লাখ লোকের কর্মসংস্থান।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পুরোটা বাস্তবায়নে জন্য (২০১৬-২০ সাল পর্যন্ত) ব্যয়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছিল ৩১ লাখ ৯০ হাজার ২৮০ কোটি টাকা। মোট ব্যয়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আয় ধরা হয়েছে ২৮ লাখ ৮৫ হাজার ১০৩ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক উৎস থেকে ৩ লাখ ৫ হাজার ১৮০ কোটি টাকা। লক্ষ্য ছিল ২০২০ সালের মধ্যে পদ্মা সেতু এবং ঢাকা এলিভেটেড সেতুর কাজ সম্পূর্ণ করা। প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি এবং শেষ দিকে করোনার প্রকোপের প্রভাবে ব্যয়ের লক্ষ্য পূরণ হয়নি।

সুশাসন নিশ্চিত করতে বিচার ও আইনের শাসন, সরকারি প্রশাসনে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সুশাসন উন্নীত করার বিভিন্ন কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্য ছিল এ পরিকল্পনায়। ধীরগতিতে হলেও সরকারি কর্মচারী আইন-২০১৫-এর চূড়ান্ত অনুমোদন এবং তার বাস্তবায়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের বাস্তবায়ন, মন্ত্রণালয়গুলোর বার্ষিক কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ এবং পদের শূন্যতা ও নিয়োগে স্বচ্ছতা আনা এবং সেই সঙ্গে নিয়োগে সমযোগ্যতায় নারীদের প্রাধান্য দেয়া ইত্যাদি নীতি বাস্তবায়িত হচ্ছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় পরিধিতে। লক্ষ্য ছিল আদালতে বিদ্যমান মামলার জট কমিয়ে আনা, কিন্তু উল্টো বেড়েই চলছে মামলার সংখ্যা।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়নাধীন মহাপ্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু, গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প, এমআরটি-৬ প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল প্রকল্প, পায়রা বন্দর প্রকল্প, রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প, রামপাল কয়লা-বিদ্যুৎ প্রকল্প, মাতারবাড়ি কয়লা-বিদ্যুৎ প্রকল্প ইত্যাদি। এসব মহাপ্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়ন এগিয়ে চলছে মহাকর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে।

প্রধানমন্ত্রী ১১ অক্টোবর ২০১৪ চট্টগ্রামে এক অনুষ্ঠানে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন, ‘বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাবে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করব। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ।

সেভাবে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলব’। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের ঈর্ষণীয় পথ ধরে। ‘সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা’ বাংলাদেশের উন্নয়ন-অভিযাত্রায় এক জীবন্ত দলিল।